মদীনায় সর্বপ্রথম মসজিদ

নবীজী মদীনায় একটি মসজিদ তৈরি করার ইচ্ছা করলেন। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরের সামনে একটা ফাঁকা জায়গা ছিলো। জায়গাটা কিনে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হলো। মসজিদের পাশেই কিছু ঘর তৈরি করা হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তার পরিবার নিয়ে থাকবেন।

এটাই ছিলো মদীনার সর্বপ্রথম মসজিদ। এখন যেটা মসজিদে নববী নামে পরিচিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কিন্তু এ সময়ের মতো সুদৃশ্য মসজিদ ছিলো না। তখন মসজিদের দেয়াল ছিলো মাটির। আর ছাদ ছিলো খেজুর পাতার।

মসজিদে নববীর একটি জায়গা ছিলো ইলমে দীন শেখার জন্য নির্ধারিত। সেখানে একদল সাহাবী সবসময় ইলম শেখার জন্য পড়ে থাকতেন। তাদেরকে বলা হতো আসহাবে সুফফা। এখানেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে দীনের হুকুম আহকাম শেখাতেন।

আযান এলো যেভাবে

সে সময়ে কিন্তু এখনকার মতো ঘড়ি ছিলো না। নামাযের সময় হলে সাহাবায়ে কেরাম অনুমান করে মসজিদে আসতেন। দেখা যেতো একেকজন একেক সময় উপস্থিত হচ্ছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করতে লাগলেন, ‘কিভাবে একই সময় সবাইকে উপস্থিত করা যায়। বিষয়টা নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। একজন বললেন, নামাযের সময় একটা পতাকা উড়িয়ে দিলে হয়। ওটা দেখে সবাই মসজিদে আসবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটা পছন্দ হলোনা। আরেকজন বললেন, নামাযের সময় হলে ঘণ্টা বাজানো হোক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এটাতো খ্রিস্টানদের কাজ। অন্য একজন বলে উঠলেন, ‘তাহলে আগুন জ্বালানো হোক।’ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাতো অগ্নিপূজারীদের কাজ।

সবশেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রাযি. এর প্রস্তাবমতো আযানের আদেশ দিলেন। এভাবেই মসজিদে আযান শুরু হলো।

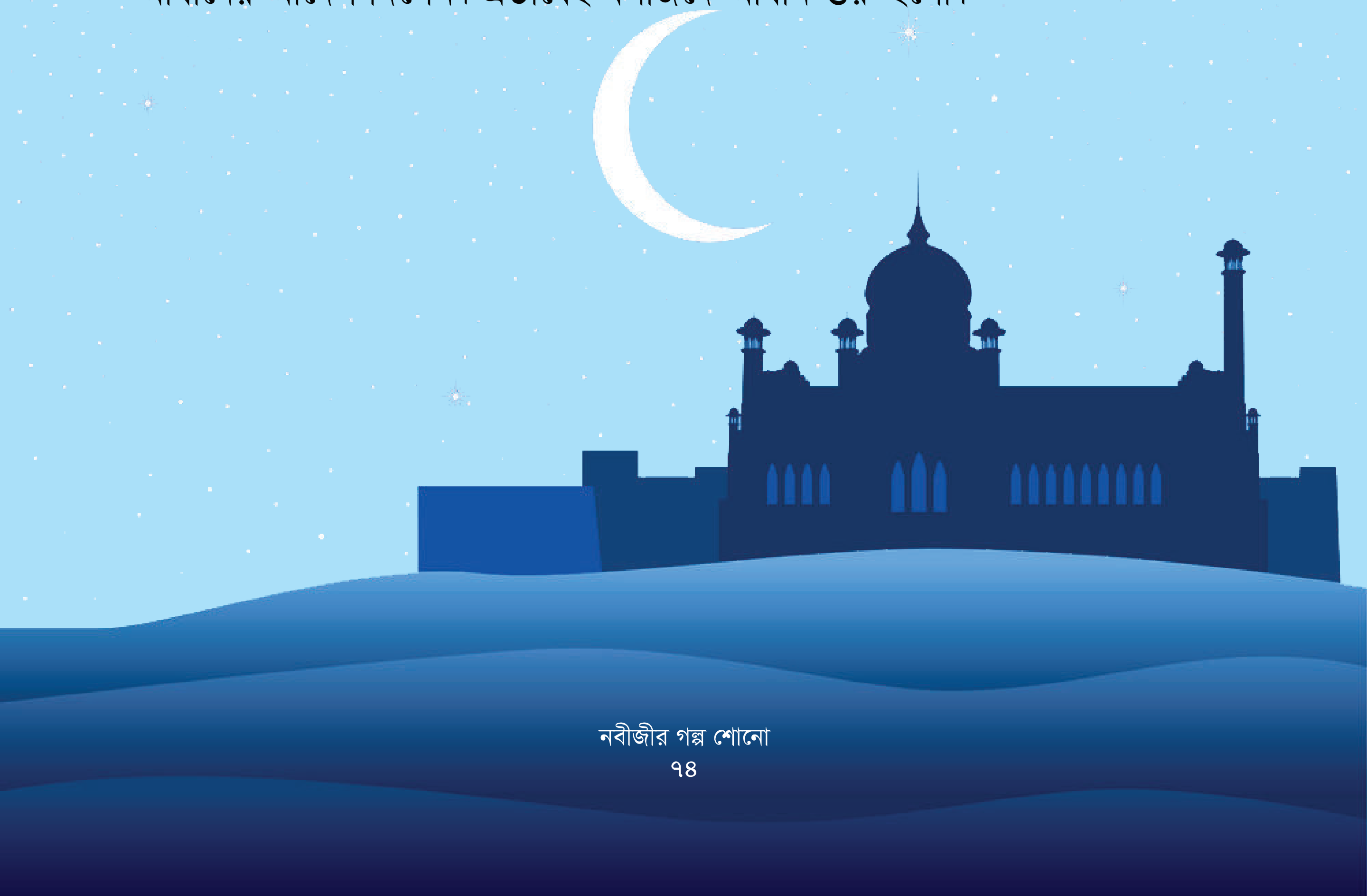

দীনের সব কাজের কেন্দ্র হলো মসজিদ

মসজিদে নববীতে যে শুধু নামায হতো তাই নয়। বরং এই মসজিদই ছিলো মুসলমানদের সম্মিলন স্থল। ছিলো ইসলাম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই নির্মাণ করা হয়েছিলো ইসলামী সমাজ, পরিচালনা করা হয়েছিলো দেশ।

এখান থেকেই আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের সাথে প্রকাশ্য লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হয়েছিলো। ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।

দেখতে খুবই সাধারণ এ মসজিদ থেকে কিভাবে এতো কিছু করা হলো সে গল্পই এখন তোমাদের বলছি।

সব মুসলমান ভাই ভাই

মসজিদে নববী নির্মাণের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির আর আনসারদেরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন।

তোমরা হয়তো ভাবছো, মুহাজির কারা, আনসারই বা কারা?

হ্যাঁ, যেসব মুসলমান মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় মুহাজির। আর মদীনায় যেসব মুসলমান ছিলেন তাদেরকে বলা হয় আনসার।

মুহাজিররগণ ছিলেন একেবারে রিক্তহস্ত। তারা নিজেদের সব সম্পদ মক্কায় রেখে খালি হাতে মদীনায় এসেছিলেন। এজন্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির আর আনসারদেরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন; যেনো তারা একে অপরের সাহায্য করতে পারে।

আনসাররা সব কাজে মুহাজিরদেরকে সাহায্য করতে লাগলেন। এমনকি নিজেদের ধন-সম্পদও মুহাজির ভাইদের জন্য উজাড় করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মুহাজিররা এ সাহায্যের কারণে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তবে শুধু সাহায্যের উপর বসে না থেকে তারা নিজেরাও কাজ করতে শুরু করলেন।

মদীনা শাসনে নবীজী

আগেই তোমরা জেনেছো যে, মদীনায় তখন আদিবাসী হিসেবে বাস করতো আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা। তাদের পাশাপাশি বাস করতো কিছু ইয়াহুদী। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে মদীনায় এসেছিলো।

ইয়াহুদীরা নিজেদের স্বার্থে মদীনার আদিবাসীদের মধ্যে অনেকদিন ধরে ঝগড়া বাঁধিয়ে রেখেছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মুসলমান ও মদীনার আদিবাসী অমুসলমানদের মধ্যে একটি চুক্তি স্থাপন করেন। এটাকে বলা হয় ঐতিহাসিক ‘মদীনা সনদ’। এ চুক্তির কারণে মদীনার লোকেরা খুব শান্তিতে জীবন যাপন করতে লাগলো।

ইয়াহুদীরা এসব দেখে মনে মনে খুব ক্ষিপ্ত হচ্ছিলো কিন্তু কিছু বলতে পারছিলো না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথেও একটি শান্তি চুক্তি করে নিলেন। চুক্তির শর্ত মেনে নিয়ে ইয়াহুদীরা মদীনার নিরাপদ নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে থাকলো।

কুরাইশরা মুসলমানদেরকে হুমকি দিতেই লাগলো।

মক্কা থেকে মুসলমানরা যখন চলে এসেছেন তখন কিন্তু কাফেররা তাদের সব সহায় সম্পত্তি আটকে রেখেছিলো। মুসলমানদেরকে সাথে করে কিছুই নিয়ে যেতে দেয়নি।

কিন্তু তারপরও কাফেরদের হিংসা শেষ হলো না। ওরা যখন দেখলো, মুসলমানরা মদীনায় গিয়ে খুব শান্তিতে বসবাস করছে তখন তাদের সহ্য হলো না। মদীনার লোকদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে বললো, 'তোমরা যে মুসলমানদেরকে নিজেদের দেশে থাকতে দিয়েছো এর পরিণাম কিন্তু ভালো হবে না।'

কুরাইশরা শুধু এতটুকু বলেই থামলো না। তারা মুসলমানদের জন্য হজ উমরা নিষিদ্ধ করে দিলো। মদীনার মুহাজিরদের কাছে তারা সংবাদ পাঠালো, 'তোমরা নিরাপদে মদীনায় চলে গেছো বলে অহংকার করো না। আমরা ইচ্ছা করলে মদীনা থেকেও তোমাদের তাড়িয়ে দিতে পারবো'।

জিহাদের ডাক...

কুরাইশরা শুধু হুমকিই দিচ্ছিলো না। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়া থেকে অস্ত্র কিনে আনতে লাগলো। এসব অস্ত্র দিয়ে মাঝে মাঝেই মদীনার সীমান্তে ছোট ছোট হামলা করতে লাগলো।

সিরিয়ায় যেতে হলে কুরাইশদেরকে মদীনার পাশ দিয়েই যেতে হতো। একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পেলেন কুরাইশদের একটা বাহিনী সিরিয়া থেকে ফিরছে। বহিনীর নেতা হলো আবু সুফিয়ান। তাদের সাথে অনেক ধন সম্পদ আছে। এসব ধন সম্পদই তারা একসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। মুসলমানদের রক্তে নিজেদের হাত লাল করবে।

মুসলমানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ডাক দিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে মুহাজির ও আনসাররা সাড়া দিলেন।

সবাইকে নিয়ে তিন শ’ তেরো জনের একটি বাহিনী তৈরি করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হলেন।

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী জযবা

এদিকে আবু সুফিয়ান যখন এ খবর পেলো তখন সে খুব ভয়ে পেয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি সে মক্কায় সাহায্যের জন্য খবর পাঠালো। মক্কার কাফেররা এ খবর পেয়ে দেরি না করে আবু জাহলের নেতৃত্বে বিশাল এক বাহিনী তৈরি করে ফেললো। সংখ্যায় তারা ছিলো এক হাজারের বেশি। শত শত ঘোড়া, হাজার উট আর অনেক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে রওয়ানা হলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরাশদের বাহিনী আর তাদের অস্ত্র শস্ত্রের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এই বাহিনীর সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত?

সাহাবায়ে কেরাম তো তখন শাহাদাতের জন্যই তৈরি হয়ে আছেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ‘হুযূর! আমরা আমাদের জীবন চলে যাওয়া পর্যন্ত আপনার সাথে থেকে জিহাদ করবো। আনসারদের মধ্য থেকে হযরত সা‘আদ ইবনে মু‘আয রাযি. বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন তবুও আমরা পিছু হটবো না।’